বিভা

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

BIBHA
A Bengali Novel by Jibanananda Das
Edited By Gautam Mitra

First Punascha Edition
January, 2026

ISBN 978-81-7332-387-4

Price ₹ 295

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আর্ট ক্রিয়েশন

দাম ₹ ২৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন -৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

ভূমিকা

প্রথমেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি স্নেহাশিস পাত্রের মেধাবী সম্পাদনা ছাড়া আমরা 'বিভা' উপন্যাসের নির্ভুল পাঠ আমরা পেতাম না। দেবেশ রায়, ভূমেন্দ্র গুহ ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে রেখেও বলি, স্নেহাশিসবাবু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন সম্পাদনা কাকে বলে। জীবনানন্দ দাশের 'বিভা' উপন্যাসটির প্রতিটি অক্ষর ধরে ধরে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে এই পাঠ তৈরি করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য আমরা দেবেশ রায়ের অসম্পূর্ণ ও ভুলে ভরা পাঠটি ব্যবহার না করে স্নেহাশিস পাত্রের পাঠটি গ্রহণ করেছি। স্নেহাশিস বাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে একটা কথা, আমিও সামান্য হলেও জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের কাজে বিগত পঁচিশ বছর ধরে যুক্ত আছি, আমার মনে হয়েছে 'সূর্য'-কে সূর্য না লিখে জীবনানন্দর মতো 'সূর্য্য' লিখলে পাঠকদের ওপর অবিচার করা হবে। লেখাগুলো রচিত হওয়ার প্রায় পাঁচ দশক পর প্রকাশিত হয়েছে, এখন যদি 'বল্লে' বা 'এম্নি' ইত্যাদি ছাপানো হয়, বুদ্ধির গোঁড়ায় ধোঁয়া দেওয়া হয় বটে, তবে চোখ ও মনের বিবাদ কী দূর হয়! কিংবা পাণ্ডুলিপিতে 'বিভা'-র পরিবর্তে 'B' লিখেছেন বা 'টলস্টয়'-এর পরিবর্তে 'Tolstoy' লিখেছেন বলে, স্বয়ং জীবনানন্দই কি মুদ্রিত পাঠে এগুলো পরিবর্তন করতেন না! তবে এগুলো সামান্য মতানৈক্য। এ দিয়ে স্নেহাশিসবাবুর সম্পাদনাকে কোনওভাবেই খাটো করা যায় না।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বিভা' উপন্যাস শুরু করছেন এভাবে, 'বিভার মুখের লাবণ্য বেশ উচ্চজাতীয়'। লিখছেন, 'সচরাচর এরকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে

না'।খুব 'অবর্ণনীয়' সৌন্দর্য নয় তবে ধরণটা 'চিত্তাকর্ষক'। লিখছেন, বিভাকে দেখলে 'গঙ্গাসাগরের মেলা' দেখতে গিয়ে মৃত ষোলো সতেরো বছরের সেই পারাগাঁর মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায়। আমরা তো কবিতা ও ডায়েরির সূত্রে জানি যে সেই মেয়েটির নাম মনিয়া। 'কবিতায় আছে,'...কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো/গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে...'। মনিয়া তো তবে ১৯৩০-এর আগে মারা গেছে আর জীবনানন্দ তা লালন করছেন অন্তত ১৯৩৪ অবধি। কারণ 'রূপসী বাংলা' লেখা হবে ১৯৩৪-এ। এবং যে বাংলা ও মনিয়া জীবনানন্দ দাশের কাছে সমার্থক।

এবং বাস্তবের যে ক'জন মহিলার ভাবনা জীবনানন্দ দাশকে বারবার আলোড়িত করেছে, ঘাড়ে ধরে লিখিয়েছে,স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে তাদের মধ্যে মনিয়া অন্যতম। জীবনানন্দ দাশের ডায়েরিতে সংক্ষেপে মনিয়া বা মনির পরিচয় এইরকম। পর্তুগিজ পাদ্রী বাবার ঔরসে ও বাংলাদেশের মায়ের গর্ভে জন্ম 'নীলনয়না' মনির। মনির ছোটো বয়সে পাদ্রী বাবা বেপাত্তা হলে,অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে মনির মা 'সর্বানন্দ ভবন'-এরই কাছাকাছি কোনও জায়গায় থিতু হলেন। ডানপিটে ছিল মনি। একটু স্বপ্নপ্রবণ। হুজুগে। সমবয়সীদের কাছে আকর্ষণীয়া। জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়'-এ মনির শিক্ষকও ছিলেন। 'অনুশীলন সমিতি' থেকে পুলিশের লাঠির আঘাত—কোথায় না মনিয়া নেই। একটু বন্য ধরনের? মনিয়া কাঁঠাল গাছ থেকে বাড়ি মেরে পাখি ফেলল, কী যেন পোকা খাচ্ছিল।

মায়ের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করে মনি।জীবনানন্দের শহর ফেরত ভাইদের কাছে মনিয়া একজন 'ঝি'। তারা তাকে 'পারস্যুয়েড' করে। বন্ধু অবনী তাকে 'অপব্যবহার' করে। মনিয়ার 'exultation, depression, fondness, desire and her fate' জীবনানন্দকে স্পর্শ করে যায়। ডায়েরিতে পরিকল্পনা করছেন মনিয়াকে নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। শিরোনামও দিয়েছেন সেই ভাবনার। 'A Girl's World : A Novel' বড়ো গূঢ় কথা বলছেন জীবনানন্দ মনিয়া প্রসঙ্গে। লিখছেন, 'বাংলা দেশ...The Author's poetry and philosophising...মনির বাংলা...Bengal containing such girls.'

'বিভা' উপন্যাসে এর সঙ্গে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই, বিভা ও মনিয়ার মুখের আদলের সঙ্গে মেলে এমন একটা বাস্তবসম্মত নাম পেয়ে যাই। রুথ চ্যাটারটন। মনিয়ার কোনও ছবি নেই, বিভা কল্পনা, আমরা মনিয়া বা বিভার চেহারার যেন একটা আভাস পেলাম। জীবনানন্দ দাশ লিখছেন, 'মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি(মনিয়া) বিভা—আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন'।

এখানে পূর্ববর্তী দুজন সম্পাদকই একই ভুল করেছেন। দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় 'রুথ চ্যাটার টম' স্নেহাশিসের সম্পাদনায় 'রুথ চ্যাটারর্টম' হয়েছে মাত্র

কিন্তু প্রকৃত রুথ চ্যাটারটনকে কেউ খুঁজে পাননি। একটানে লেখা ‘চ্যাটারটন’ সম্পাদকদের চোখে চ্যাটারটম হিসেবে ধরা দিয়েছে।একটু লক্ষ্য করলে দেখতেন আমি বহুদিন আগে বিভা ও রুথ চ্যাটারটনকে নিয়ে লিখেছি কেননা রুথ চ্যাটারটম বলে কারও অস্তিত্ব কখনও ছিল না। রুথ চ্যাটারটন (১৮৯২-১৯৬১) প্রখ্যাত আমেরিকান মঞ্চ ও চলচিত্রের অভিনেত্রী। ১৯২৯-এ চ্যাটারটন অভিনীত একটি বানিজ্যসফল সিনেমা ‘ম্যাডাম এক্স’ নিশ্চয় কলকাতায় রিলিজ হয়েছিল। জীবনানন্দ এই রুথের কথাই বলেছেন।

‘বিভা’ উপন্যাস পড়তে গিয়ে শুরুর এই গমক সামলাতে সময় লাগে। জীবনানন্দর অনন্য গদ্য ও ভাবনা আমাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করে। ‘বিভা’ উপন্যাসের নামকরণ জীবনানন্দ নিজে করেছেন।যদি ‘বিভা’ নামটি জীবনানন্দর একটা আইডিয়া হয়, তবে সেই পরধি থেকে কেন্দ্র অবধি বিস্তৃত আইডিয়াটির নাম হল সৌন্দর্য। ‘ছিপছিপে নিমীলিন চাঁপাফুল’ কিংবা ‘একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মতো নালীর আঙুল’-এর সৌন্দর্য। জীবনানন্দর কবিতায় যে ‘বিভা’-কে পাই, সেও যেন উপন্যাসের ‘বিভা’-র পরিপূরক:

‘ছেঁড়া শাড়ি পরে কাটাইতে দিন
বাঁটনা হলুদ মাখা
বিভারানী বোস, তোমার দু হাতে
ছিল দুটো শাদা শাঁখা,
শাদা শাঁখা শুধু তোমার দু হাতে
জুটত না তেল চুলে,
তবুও আমরা দিতাম আকাশে
বকের পাখনা তুলে।

জুটিত না কালি কলম আমার
কাগজে পড়িত টান,
তোমার বইয়ের মার্জিনে, বিভা,
লিখিতাম আমি গান।
পাশের বাড়ির পোড়া কাঠ এনে
দেয়ালে আঁকিতে ছবি।
আমি বলিতাম— ‘অবন্তী-বিভা’,
তুমি শুধাইতে ‘ঈগল কবি’।...

ফিরে চাই আমি তোমারে আবার
আমার কবিতা, তোমার ছবি—
শুধাতাম আমি ‘অনুরাধাপুর—’

শুধাইতে তুমি ‘শকুন কবি’
সেই যে আকাশ খোঁজার স্বপ্ন
দুখের ছররা—সে যেন ঢিল,
আমরা দুজনে বেগুনি আকাশে
সোনালি ডানার শঙ্খচিল।’

‘বিভা’ উপন্যাসে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে। মনে হয় যেন গার্সিয়া মার্কেজের কোনও উপন্যাস পড়ছি। সেরকম জাদুবাস্তব। সেরকম ওলটপালট। কীভাবে লেখেন ১৯৩৩-এ এমন অনন্তে পাওয়া একটি উপন্যাস।তখন কোথায় মার্কেজ?

মার্কেজের ‘আমার বিষাদক্লিষ্ট গণিকাদের স্মৃতি’ উপন্যাসটির কথা যদি ভাবি, তা-ও তো এই সৌন্দর্যে পাওয়া নিয়ে। পেনশনভোগী, লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষার প্রাক্তন শিক্ষক যাকে ছাত্ররা আড়ালে ‘বিষণ্ণ পর্বত’ বলে উপহাস করে, নব্বই বছরের বৃদ্ধ, পূর্বপরিচিত এক গণিকালয়ের মালিকিনকে তাঁর জন্য একজন কুমারী মেয়েকে জোগাড় করতে বলে যার সঙ্গে সে নব্বইতম জন্মদিনের রাত কাটাবে। সেই মেয়েটির নাম দেলগাদিনা। শব্দটি delgado বা la delgadez থেকে এসেছে যার অর্থ সুচারুতা। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে মেয়েটি ঘুমিয়ে থাকে আর বৃদ্ধ জেগে বসে থাকে। একটিবারের জন্যও মেয়েটিকে স্পর্শ করে না। কারণ মার্কেজের মতে, ‘ধারণ করেছে যে, সৌন্দর্য সে চোখের।’ প্রকৃত নিঃস্ব হতে পারলেই বুঝি দেখা মেলে সেই বিরল প্রেমের। সবকিছু তখন ম্যাজিক। দেবদূতেরা হাত ধরাধরি করে দেলগাদিনার বিছানা ঘিরে থাকে, কানে কানে লিটল প্রিন্স বা আরব্য রজনীর গল্প শোনায়, দূর আকাশের কন্যারাশি তখন ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। ভোর হয়। মেয়েটি ঘুমিয়েই থাকে। সারা রাত জেগে বসে থাকা বৃদ্ধ চলে যাবার আগে মেয়েটিরই লিপস্টিক দিয়ে আয়নায় লিখে রেখে যায়, ‘হে আমার প্রিয় মানবী, পৃথিবীতে আমরা বড়ো একা’।

আসলে সৌন্দর্য বড়ো নির্জন। বড়ো নিঃসঙ্গ।বড়ো একা। যেমন বিভা। সবার মধ্যে থেকেও যে কারও নয়, কোথাও নেই। মেসের জানালা দিয়ে লেখকের ‘চোখ’ দেখে বিভাকে, বিভার সৌন্দর্যকে, এমনকি বিভা যখন টালিগঞ্জে কাকাতুয়া ছেড়ে দিতে যায়, তখনও। এমনই অপার্থিব সেই লেখকের ‘চোখ’ নাকি ‘বিভা’। যেন এ পৃথিবীর নয় তারা। কী দেখে? বরং বলা যাক,আর কী দেখ তুমি?

বিভাকে ঠকিয়ে তার কাছে মৃতপ্রায় ময়না ও রঙচঙে কাকাতুয়া বিক্রি করে গেল এক ফেরিওয়ালা। বিভা পাখি পোষার,খাঁচায় পুরে যন্ত্রণা দেবার পক্ষপাতী নয়। ছেড়ে দেবে বলেই পাখিগুলো কিনেছিল সে। এদিকে ময়নার ঘাড় মটকে দিল পাশের বাড়ির বিড়াল আর সেই বিড়ালটাকে মেরে ফেলল বাড়ির পরিচারক সুদর্শন।এদিকে কাকাতুয়াটা পোষ না মেনে নিজেই নিজেকে রক্তাক্ত করে।

মোক্ষদাচরণ আসে বিভার সঙ্গে গল্প করতে কিন্তু তার সাহিত্যবোধের সঙ্গে

বিভার মিল হয় না। বিভা তুর্গেনিভের ভক্ত। মোক্ষদা বিভাকে ভালবাসে কিন্তু বিভা সামান্য মমত্ব বোধ করে মাত্র। বিভা মনে করে, 'জীবন খুব সাধনার জিনিস'। মোক্ষদাকে নিয়ে সে কাকাতুয়াটিকে ছেড়ে দিতে বের হয়। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পরেও একটি ছেলে ঢিল ছুঁড়ে পাখিটিকে মেরে ফেলে। শকুন কাড়াকাড়ি করে পাখিটাকে খেয়ে নেয়।' চোখে জল এসে পড়ল' বিভার পাখিটির দুঃখে।

এরপর একজন পার্সি যুবকের সঙ্গে বিভার পরিচয় হয়। রুস্তমজি। বিভার বাবা পরিচয় করিয়ে দেয়। বিয়ে করবে বলে তিন লাখ টাকার সম্পত্তি বিভার নামে করে দিতে চায়। বিভা তার প্রেমহীনতার কথা বলে,অপারগতার কথা বলে। বিভা মনে করে নরনারীর প্রেমই তো শুধু জীবনটাকে সুন্দর করে তুলছে না, বই-গাছপালা-প্রকৃতি-চড়ুই-কৃষ্ণচূড়া-দিনের জন্ম, এরাও তো জীবনটাকে সুন্দর করে তোলে।

শেষে একজন যুবক ডাক্তার। ডাক্তার বলে, নারীরা আঘাত পেলে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। বিভা বলে, জীবনকে জীবন বলে বুঝতে এখনও ঢের দেরি আপনার। ডাক্তার বলে, জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কখনও বইকে সাক্ষী মানবেন না, ঢের আঘাত পাবেন। বিভা বলে, কেন? উত্তরে ডাক্তার বলে, এদের কবিতার ভেতর রক্তমাংসের ঘ্রাণ কোথাও নেই, প্রেমকে নিয়ে না আছে ঠাট্টা না আছে তিক্ততা, না আছে নোংরামি না আছে হতাশা, তিক্ত একটা দার্শনিক বিন্দু অবধি কোথাও নেই।শুধু গভীর আন্তরিক অটুট প্রেমিক প্রাণ, অমৃতলোকের সাহিত্য তৈরি করে যাওয়া। বিভা বলে,পৃথিবীতে অলস তাহলে আমি একাই শুধু? কার সঙ্গে সমস্তটা দুপুর কথা বলব তাই ভাবি। ডাক্তার বলে, আমার সঙ্গে তো সমস্ত জীবনটাই কথা বলতে পারতেন। বিভা বলে, আমি শুধু দুপুরের কথা ভাবি।

শেষটা বড়ো বেদনার। মোক্ষদা ও ডাক্তার, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বিভার মা মারা গেছে। বাড়িতে এখন শুধু বাবা ও মেয়ে। জীবনানন্দ লিখছেন:

'সেই জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে একটা সরু দীর্ঘ বারান্দা ধরে শোবার ঘরের দিকে বাপমেয়ে নিঃশব্দে চলতে লাগল-মনে হ'ল যেন কোন মৃত্যু ও নিশ্চিহ্নতার দিকে এ দুটি নিস্তব্ধ প্রাণী যাত্রা করেছে, পৃথিবীর কাছে এই তাদের শেষ হিসাব। কারু দয়া ভিক্ষা এরা হয়তো করছে না; কিন্তু তবুও কেমন একটা কাতর করুণায় হৃদয় ভরে উঠল আমার। অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম।'

দেলগাদিনার মতো বিভাও একটা প্রতীক। কনসেপ্ট মাত্র। কোথাও এগজিস্টই করে না,অথচ মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরেই তার হারিয়ে যাওয়া ডানা মেলবার প্রেকটিস করে। বিভার কোনও গতি নেই অথচ সকল গতিকে সে ধারন করে। বিভার কোনও মাধ্যাকর্ষণ বল নেই অথচ সমস্ত প্রেম তাকে ঘিরেই আবর্তিত। শেষ মীমাংসায় সৌন্দর্যর অপর নামই তবে বিভা?

পূর্ববর্তী ২ টি সম্পাদকের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা জরুরি। তবে দেবেশ রায়ের সম্পাদকীয়টি স্নেহাশিসবাবু তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন বলে আলাদা করে আর উল্লেখ করলাম না। নীচে স্নেহাশিস পাত্রর 'প্রসঙ্গত' শীর্ষক রচনাটি:

‘সময়টা মার্চ ২০১৫। জীবিকার সন্ধানে শহর-কলকাতায় এসেছি অনেক আগেই। নানা জায়গার ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম কবি শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গোছানোর কাজে। সেখানে আলোকচিত্রী প্রদীপ দত্তের সূত্রে পরিচয় হল কবি-চিকিৎসক ভূমেন্দ্র গুহ-র সঙ্গে। লেগে গেলাম তাঁর করুণাময়ীর বাড়িতে বইপত্র গুছিয়ে দেবার আংশিক সময়ের কাজে। নানাজনের বাড়িতে বইপত্র গুছিয়ে দেওয়াই তখন আমার মূল জীবিকা। ধীরে ধীরে ভূমেনবাবুর সঙ্গে আলাপ গাঢ় হল। নানা ব্যক্তিগত কথার ফাঁকে তিনি জেনে নিলেন আমার জানা বিভিন্ন কাজের মধ্যে কম্পোজ করার বিষয়টিও।

একদিন ভূমেনবাবু বাড়ির বারান্দায় নিয়ে গেলেন। কাপড়ের ঢাকা সরিয়ে দেখালেন ডাই-করা পাণ্ডুলিপির ফটোকপি। বললেন, এগুলি জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপির ফটোকপি-জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিনি উদ্ধার করেছেন। পাণ্ডুলিপির এই ফটোকপি ‘উদ্ধার করা’ নিয়ে বাংলাদেশের বেঙ্গল পাবলিকেশন্স-এর নির্বাহী পরিচালক আবুল হাসনাত লিখেছেন:

কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত জীবনানন্দ দাশের মূল রচনা উদ্ধারের জন্য (জেরক্স কপি) তাঁকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। যে-কোনো সরকারি আপিসে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য থাকে। তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এমন কিছু সজ্জন ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁদের সহায়তায় কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভূমেন্দ্র গুহ এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। হতোনাম হওয়ার মতো কত কিছুরই না সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। এ-টেবিল থেকে সে-উকিলে তাঁর আবেদনপত্রটি চালাচালি হয়েছিল। পরে যখন ধৈর্যচ্যুতির মতো অবস্থা, তখন এক সজ্জন সাহিত্য-অনুরাগীর [গ্রন্থাগারের তৎকালীন ডিরেক্টর-জেনারেল অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী।] সহায়তায় লাভ করেন কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার জেরক্স কপি। এই কপিকে অবলম্বন করে তরুণ গবেষকের মতো তিনি মূল পাঠের উদ্ধারকাজে ব্রতী হন।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, জীবনানন্দের কিছু কবিতা-গল্প উপন্যাস পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে মূলানুগ পাঠ তৈরি করে, ঢাকার বেঙ্গল পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশের পরিকল্পনার কথা। যে-কারণে বারান্দায় রাখা পান্ডুলিপির ফটোকপির গাদা থেকে একটা গোছা তুলে আমার হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। প্রস্তুতিহীন সেই পরীক্ষায় একরকম উতরে গেলাম। এর ফলস্বরূপ তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন জীবনানন্দের ছোটগল্পের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি। বাড়ি থেকে সেগুলি টাইপ করে এনে দিতে হবে। আমার কাজের সুবিধার জন্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে দিলেন প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ সমগ্র-র খণ্ডগুলিও। সেই খণ্ডগুলির সঙ্গে পাণ্ডুলিপি মেলাতে মেলাতে এগোচ্ছি আর মাঝে মাঝেই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রকাশিত গল্পের অসংগতিগুলি দেখাচ্ছি তাঁকে।